কবরেরও ঘুম ভাঙ্গে-
জীবনের দাবি আজ এতই বিরাট!

আমি মুজাম্মিল হুসাইন সাইমন। বয়স ৩৩ বছর। কয়েদী নং ৫৬৩১/এ। আমি একজন মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দী। আজ ৩০ জুলাই, ২০২৪ তারিখে কাশিমপুর, গাজীপুরে অবস্থিত হাই-সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের এক নির্জন সেল থেকে লিখছি।

আমি ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, আনন্দমোহন কলেজ এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যয়ন করেছি। পেশাগত জীবনে আমি কম্পিউটার প্রকৌশলী ছিলাম। আমার স্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যয়ন করেছেন। আমাদের এক মেয়ে (৯), এক ছেলে (৮) রয়েছে। আমার বাবা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ফ্লাইট সার্জেন্ট ছিলেন। আমার মা গৃহিণী।

এছাড়াও, আমি একজন মুসলিম। বিশেষত, আমার ভূতপূর্ব শিক্ষক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও তার আল্ট্রা-সেক্যুলার ভক্তবৃন্দের কপটতা প্রকাশিত হবার পর, ক্যাম্পাসে আমি তাদের সক্রিয় বিরোধিতায় লিপ্ত হই। এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী অন্যায়ভাবে কখনো শিবির, কখনো হিজবুত তাহরির এবং সবশেষে জংগী আখ্যায়িত করার এক পর্যায়ে, তারা হাসিনার গুন্ডাবাহিনী আমার পেছনে লেলিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়। যদিও প্রায় তিন বছর আমি ‘নিরাপদ’ ছিলাম, তবুও আমার বন্দীত্ব আগেই অনিবার্য করে তোলা হয়েছিল! কারণ আর কিছুই নয় এই ব্যাতীত- আমি ইসলামের পুনরুত্থানে বিশ্বাসী একজন দাঈ, এক্টিভিস্ট ও লেখক ছিলাম।

ফলশ্রুতিতে এর কিছু সময় পর, একজন পিতা, পুত্র, স্বামী, ভাই, মুসলিম কিংবা মানুষ হিসেবে দীর্ঘদিন অস্তিত্বশীল থাকার পর হাসিনার দোসর ডিবি (পরবর্তীতে সিটিটিসি গঠিত হয় ডিবির একাংশের নেতৃত্বে) আমাকে নতুন এক পরিচয় দেয়। যে পরিচয় আমার বাকি সকল পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক ও অস্তিত্বহীন করে ফেলে।

২০১৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর দুপুরে বাউনিয়া, ঢাকাস্থ বাসা থেকে সিটিটিসির তৎকালীন প্রধান গোপালগঞ্জের মনিরুল ইসলাম (বর্তমানে এসবি প্রধান) এর নির্দেশে ২০-২৫ জনের একটি দল আমাকে স্ত্রী-সন্তানের সামনে থেকে তুলে নিয়ে যায়। আমার পরিবার জিডি করতে চাইলে জানানো হয়, সিটিটিসি’র নিষেধ রয়েছে। এভাবেই নিশ্চিত করা হয় গুম রাখার পথ। যত দিন ইচ্ছা। তবে, আসন্ন পুলিশ সপ্তাহে বিপিএম, পিপিএম পদক বাগানোর তাড়া থাকায় তারা “মাত্র” ৪৮ দিন গুম করে রেখে “কাজ” আদায়ে তৎপর হয়।

নতুন পরিচয় এবং অনেকগুলো ছদ্মনামে অলংকৃত করে ১৯শে নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে জাতির সামনে হাজির করা হয়। যে পরিচয় ব্লটিং পেপারের মত শুষে নেয় আমার অন্য সকল পরিচয়। দাবী করা হয়,

আমি গোপন ও নিষিদ্ধ এক সংগঠনের সক্রিয় সদস্য এবং ইসলামবিদ্বেষী ব্লগার হত্যা মামলার অন্যতম অংশীদার!

আমি পরিণত হই না-মানুষ এ। অন্ধকার যুগের (dark age) ইউরোপে যাদের বলা হত Homo Sacer! যার কাজ কেবল খাওয়া, ঘুম আর শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া। আজ প্রায় সাত বছর সম্পন্ন হতে চললো- হয়তো আরো চলবে- হাসিনার আরেক নিপীড়ক প্রতিষ্ঠান কারা প্রশাসন নূন্যতম খাদ্য, তিনটি কম্বল, কিছু পোশাক এবং নিঃশ্বাস নেয়ার 'বিশাল সুযোগ' করে দিয়েছে। নাকচ করেছে বাকি সব অধিকার। এমনকি ইসলামী বই দূরে থাকুক – সাধারণ ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি বিষয়ক বই পর্যন্ত পড়তে দেয়া হয় না। পরিবার দূরে থাকুক, আইনজীবি বা মানবাধিকার কর্মীদের উদ্দেশ্যে পর্যন্ত চিঠি লিখতে দেয়া হয় না; যা ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসনামলেও অত্যন্ত সাধারণ বিষয় ছিল!

অতঃপর, ২০২১ সালে হাসিনার ক্যাঙ্গারু কোর্ট – সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনালের বিচারক মুজিবুর রহমান- কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও, অভিযুক্তদের থেকে গুম ও নির্যাতনের মাধ্যমে জোরপূর্বক আদায়কৃত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে পরস্পরবিরোধ ও অসংগতি থাকা সত্ত্বেও ঢালাওভাবে মৃত্যুদন্ডাদেশ দিয়ে আমাকে না-মানুষে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে পূর্ণতা দান করে।

আমি দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট ভাষায় বলছি, আমি নিরপরাধ। আমি কখনোই কোনো সংগঠনের (প্রকাশ্য বা গোপন) সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সদস্য ছিলাম না। প্রত্যক্ষভাবেও না, পরোক্ষভাবেও না। আমার থেকে জবানবন্দী প্রচন্ড শারীরিক ও মানসিক চাপ প্রয়োগ করে আদায় করা হয়েছে।

অদ্য লেখাটি আমার বাইরে পাঠানোর ইচ্ছা ছিল হাসিনার সরকারের পরিবর্তনের পর অথবা মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর হবার আগে আগে। যা বেশ দূরবর্তী মনে হচ্ছিল যেহেতু হাসিনা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরঙ্কুশ আনুগত্য উপভোগ করছিল এবং নিম্ন আদালত ফাঁসির রায় দেয়ার পর হাইকোর্ট, আপীল বিভাগ ও রিভিউয়ের দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে কার্যকর হতে সাধারণত ৮-১০ বছর লেগে যায়।

তবে, ইতিহাস ও রাজনীতি সাধারণ জ্ঞান থাকা যে কোনো ব্যক্তির ন্যায় আমারও প্রবল ধারণা- হাসিনার পতন কেবল সময়ের ব্যাপার। হাসিনার আজ্ঞাবহ কারা প্রশাসন অত্যন্ত চিন্তিত। তারা পত্রিকা, পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ-সহ সকল স্বাভাবিক প্রয়োজন বন্ধ করে দিয়েছে। রেডিও'র খবর এবং হাসিনার অনুগত প্রতিষ্ঠানের নজিরবিহীন অস্থিরতা নিঃসন্দেহে হাসিনার পতনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতই দেয়। '৬৯ এ মাত্র ৬০-৬৫ জনের নিহত হওয়াই আইউবশাহীর পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর তাই আমি বিশ্বাস করি, ইতিমধ্যেই কয়েকশ প্রাণের অকাতর আত্মত্যাগ থেকে জাতিকে হাসিনার উৎপাত ইন শা আল্লাহ মুক্তি দেবেই দেবে!

স্বৈরশাসন ও নিষ্পেষণের যুগ শেষ হবার পথে দেশ ও জাতি এক যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত। এখনের মুহূর্ত '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন আসাদুজ্জামানকে হত্যা করা হয়। আর কবি সন্তোষ গুপ্ত তার ঐতিহাসিক পঙক্তিগুলো লেখেন-

মৃত্যুর জানাজা মোরা কিছুতেই করিব না পাঠ,

কবরেরও ঘুম ভাঙ্গে-

জীবনের দাবি আজ এতই বিরাট!

এমন অবস্থাতে আমি নি:স্তব্ধ না থাকাই সঠিক মনে করছি। এতে পরবর্তীতে আমার পরিণতি নিয়ে ভাবার খুব সুযোগ আর দেখছি না! কিছু বিষয় লেখা জরুরীই মনে করলাম। দুয়া করি, আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীর তখত উল্টে দেন এবং জমীনে ইনসাফ ফিরিয়ে দেন। আমীন।

উল্লেখ্য, বিগত সাত বছর ধরে বন্দী অবস্থায় থাকায় পত্রিকা পাঠ এবং কারাগারে আসা রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও অন্যান্য বন্দীদের বক্তব্য শোনাই ছিল দেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে জানার মাধ্যম। ইতিপূর্বে নিয়ত ছিল ইসলামপন্থীদের মধ্যকার গ্রহণযোগ্য, সাহসী ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন কোনো আলেম ও দাঈর পাশাপাশি 'নিউ এইজ' পত্রিকার সম্পাদক জনাব নুরুল কবীরের উদ্দেশ্যে অত্র লেখাটি পাঠানোর। ১/১১ পরবর্তী সামরিক শাসনামল এবং পরবর্তীতে হাসিনার আমলে সর্বজনার নুরুল কবীর, ফরহাদ মজহার, মহামুদুর রহমান এবং (কিছুটা পরে) প্রয়াত ড. পিয়াস করীমের ভূমিকা আমার কৈশোরের শেষ ও যৌবনের শুরুর দিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে আদর্শিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে। পরবর্তী সময়ে আদর্শিক পার্থক্য তৈরী হলেও, জনাব নুরুল কবীর সবসময়ই এবং এখনো অনন্য এক ব্যক্তি হিসেবে মূল্যায়িত। ২০২১ সালে উনাকে কারাগার থেকে চিঠি লেখার উদ্যোগ নেই এবং যথারীতি কারা প্রশাসন তা অনুমোদন করা থেকে বিরত থাকে।

তবে, ইসলামপন্থী ও সেক্যুলারদের মধ্যকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা (যাদের সাথে মূলত কারাগারেই পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা ও আলাপ হয়) পিনাকী ভট্টাচার্য্য, নেত্র নিউজের সম্পাদক তাসনীম খলিল এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের সামীকে আমার অবস্থা তুলে ধরতে অনেকবারই পরামর্শ দিয়েছেন। আর সফলতা কেবল আসে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই।

আসলে স্বাভাবিক তো ছিল গণমাধ্যমের দ্বারস্থ হওয়া। কিন্তু আওয়ামী লীগের পদলেহী গোয়েবলসীয় মিডিয়া অদূর ভবিষ্যতে সততা, বস্তুনিষ্ঠতা ও সৎসাহস অর্জন করবে, এমনটা আশা করা ইউটোপিয়ান চিন্তাই মনে হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

আমি লিখেছি সংক্ষেপে ব্যক্তিগত আখ্যান/ anecdote – যা মানুষকে জানানো প্রয়োজনবোধ করি। এছাড়াও ইসলামপন্থী, লিবারেল ও মার্ক্সিস্টদের মধ্যকার চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য কিছু কথা সংক্ষেপে লিখেছি। আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য সহজ করে দিন। তারপর –

ডিবি, সিটিটিসি, RAB বা ডিজিএফআই কাউকে গুম করলে কিভাবে এবং কি প্রক্রিয়ায় অমানুষিক নির্যাতন করে, তা সচেতন সকলেরই বোঝার কথা। এছাড়া ব্যক্তিগত সমস্যা বা দুঃখকষ্টের ব্যাপকভাবে প্রকাশ্যে আলোচনা করা কিছুটা বিব্রতকর ও স্থুলও মনে হয়। তাই যতটুকু না বললেই নয় এবং না-মানুষরা যে বিশেষ ট্রিটমেন্ট পেয়ে থাকেন, তা সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি।

গ্রেফতারের পর ডিবি অফিসের অন্তর্গত সিটিটিসি ভবনের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত থাকায় প্রথম এক মাস সার্বক্ষণিক হাত-পা-চোখ বেঁধে একটি স্থানে (তাদের ভাষায় টিম) ফেলে রাখা হয়। অতঃপর, শুভ উদ্বোধনের সাথে সাথে সিটিটিসি ভবনের নীচতলায় অবস্থিত সুরক্ষিত গারদে স্থানান্তরিত করা হয়। নির্যাতনের নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োগ হয় পায়ের তালুতে প্রচন্ড জোরে লাঠিচার্জ করা। পরে শুনেছি পায়ের তালুর সাথে মস্তিষ্কের যোগাযোগ অত্যন্ত তীব্র হওয়ায় তাদের 'জঙ্গী' বন্দীদের এটি একটু বেশীই ব্যাবহার হয়।

কোনোপ্রকার জিজ্ঞাসাবাদ ও কৈফিয়ৎ না দিয়েই মাসখানেক এভাবে রাখার পর নতুন সেলে স্থানান্তরের পর তারা আমাকে আলোচিত ব্লগার হত্যাকান্ডের মামলাগুলোতে নিজেকে সম্পৃক্ত করে জবানবন্দীমূলক স্বীকারোক্তি (১৬৪ ধারায়) দেয়ার আহবান জানায়।

আমি বিস্ময়াভিভূত চিত্তে এহেন অলৌকিক প্রস্তাবের বিপরীতে জানতে চাই- ঠিক কেন আমি আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করব? না কি তারা আমাকে মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থ মনে করে? আর এমন দাবীর যৌক্তিকতাই বা কি?

তখন ADC সাইফুল (পরবর্তীতে CTTC'র ডিসি এবং আরো পরে কোনো এক জেলার এসপি হয়) জানায়, *আলোচিত মামলায় সম্পৃক্ত প্রায় সকলকেই হাসিনার ঘোষিত 'জিরো টলারেন্স' নীতির আওতাভুক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ হত্যা করা হয়েছে (যাদের মধ্যে অন্যতম ২০১৬ সালের মে/জুন মাসে ক্রসফায়ারে নিহত মুকুল রানা এবং সম্ভবত কেবল তার আলোচনাই মিডিয়াতে আনা হয়)। বাকি হত্যাকারীদের বিষয়টি গোপনই রাখা হয়)। তাই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশংসা কুড়াতে এবং দায়বদ্ধতা এড়াতে মামলাগুলো নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। যেহেতু, প্রকৃত আসামী নেই, তাই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী অনিবার্য প্রয়োজন!*

আমি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর এক পর্যায়ে নভেম্বরের মাঝামাঝি আমার অসুস্থ পিতাকে তারা তুলে নিয়ে আসে। এবং জানানো হয়, ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ আনুগত্যের আগ পর্যন্ত আব্বাকে আটক রাখা হবে। প্রত্যেক পুত্রই

তার পিতাকে ভালোবাসে, এনিয়ে বিশেষ বয়ানের কিছু নেই। শুধু এটুকুই বলব যে, আব্বা আমাকে বলতেন, "বাবা! সবাই পুত্রের জন্ম দেয়, আর আমি পিতার জন্ম দিয়েছি।"

অতঃপর, শারিরীক চাপের পাশাপাশি যোগ হওয়া এই মারাত্মক মানসিক চাপের মুখে আমি তাদের প্রস্তাবে সম্মত হই। পরপর তিনটি আলোচিত মামলায় (সন্ত্রাস বিরোধী ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ১/১৯, ২৬/১৯ ও ৬৩/১৯ – দীপন হত্যা মামলা, অভিজিৎ হত্যা মামলা, জুলহাস-তনয় হত্যা মামলা) জবানবন্দী নেয়া হয়।

আশ্চর্য্যজনকভাবে লক্ষ্য করলাম, এসকল জবানবন্দী নেয়ার জন্য সিটিটিসি'র সশস্ত্র পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কক্ষে উপস্থিত থাকে এবং পুলিশের লিখে দেয়া খসড়া (আইনী ভাষায় ১৬১ ধারায় পুলিশের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দী) দেখে দেখে ম্যাজিস্ট্রেট লিখে দেন। লেখা শেষে আমার 'কষ্ট করে' স্বাক্ষর দিলেই কাজ হয়ে যায়।

জবানবন্দী আদায় করা ছাড়াও, অ্যামেরিকান এম্বাসী থেকে আগত দুই কর্মকর্তার (শ্বেতাঙ্গ অ্যাংলো-স্যাক্সন) কাছে এসব মিথ্যা কথা স্বীকার করতে হয়। কেবল তখনই আব্বাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, আমাকে ও আব্বাকে হুমকি দেয়া হয়, যদি এব্যাপারে কথা ছড়ায়- তবে পরিবারের উপার্জনক্ষম একমাত্র ব্যক্তি আমার ছোট ভাইকে তুলে আনা হবে।

একারণে পরবর্তীতে বিচারিক কাজের শেষ দিকে ৩৪২ ধারায় আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক জবানবন্দীতেও আমাকে জিম্মি করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দির আদায়ের বিষয়টি উহ্য রাখি। এভাবেই ডিবি অফিসার ও ম্যাজিস্ট্রেট গংদের সম্মিলিত প্রয়াসে সম্পন্ন হয় আমাকে না-মানুষ বানানোর প্রক্রিয়া।

পরবর্তীতে আরো ৫-৬ জনকে কাছাকাছি সময়ে এভাবেই পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট যৌথ প্রযোজনায় বলির পাঁঠা বানানো হয়। কার বাস্তবতা কি তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, তবে এই আলোচিত তিনটি মামলা কেবল এসকল গুম-নির্যাতনের শিকার হওয়া যুবকদের দেয়া 'স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী' -এর উপর ভিত্তি করেই নিষ্পত্তি করা হয়। প্রকৃত বাস্তবতা কি তা জানার জন্য রায় বাতিল করে মামলাগুলোকে উচ্চ আদালতের নির্দেশে পুন:তদন্তে পাঠানোর আবশ্যক।

এবার আসা যাক বিচারকার্যের প্রহসন প্রসঙ্গে। যেখানে বিচার বিভাগকে মানুষের শেষ আশ্রয় মনে করা হয়! মামলা তিনটির বাদী থেকে শুরু করে কোনো সাক্ষীই আসামীদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়নি। নেই অন্য কোনো প্রমাণও। অথচ, কেবলমাত্র স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর আলোকে অভিযুক্তকে সাজা দেয়া যায় না। সাজাপ্রদানের জন্য অন্তত একটি সমর্থনমূলক (corroborative) সাক্ষ্য/প্রমাণ জরুরী।

তথাপি, শুধুমাত্র আসামীদের দেয়া (বা বলা ভালো ডিবির লিখে দেয়া স্ক্রিপ্ট) স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর আলোকে ঢালাওভাবে হাসিনার ক্যাঙ্গারু কোর্ট- সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনাল- মামলা তিনটিতে ঢালাওভাবে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করে। আরো চিত্তাকর্ষক বিষয় হলো- সাজা প্রদানের একক ভিত্তি স্বীকারোক্তিমূলক

জবানবন্দীর মাঝেও রয়েছে অসংখ্য অসংগতি ও পরস্পরবিরোধ। তাই শুধুমাত্র ১৬৪ (জবানবন্দী) কে আমলে নিয়েও যদি নূন্যতম সুবিচারের চেষ্টা করা হতো – তাহলেও অব্যাহতি দেয়ার বিকল্প বিচারকের ছিল না।

আরো বিস্ময়ের বিষয় হলো- হত্যাকান্ডের সাথে সরাসরি জড়িত মর্মে অভিযুক্তদের জন্য সন্ত্রাসবিরোধী আইন (২০১৩) এর ৬(১)(ক)(অ) ধারায় আমাকে অভিযুক্ত করে সাজা দেয়া হয়েছে, অথচ প্রাথমিক স্তরের অক্ষরজ্ঞান থাকা ব্যক্তির পক্ষেও – আমার উপর আনীত সকল অভিযোগ যদি সত্যও ধরে নেয়া হয় – আমাকে ৬(১)(ক)(অ) ধারায় অভিযুক্ত করে সাজা দেয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ ছিল না। বরং ৬(১)(ক)(আ) ধারায় অভিযোগ আনতে হতো, যে ধারায় মৃত্যুদন্ডের বিধান নেই; সর্বোচ্চ হয়তো ১৪ বছর সাজা দেয়া হতো।

আলোচনা কিছুটা বেশী হয়ে গেল। মূল উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে – পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট-বিচারকদের যে নিকৃষ্ট বলয় হাসিনা রেজিম তৈরী করেছে- তার বহুস্তরী, নির্লজ্জ ও নগ্ন জুলুমের একটি চিত্র তুলে ধরা।

বিচার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট গোষ্ঠীর নোংরামী কোনো অস্পষ্ট বিষয় না। আর আগেই উল্লেখ করেছি, বিচার বিভাগকে সকল নাগরিকের লাস্ট রিসোর্ট বলা হয়ে থাকে। যখন এটাও নোংরামিতে লিপ্ত হয়, তখন 'জঙ্গী' হিসেবে চিহ্নিতরাই যে- এদেশের সবচেয়ে বেশী বৈষম্যের শিকার তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

বাংলাদেশের আইন তার নাগরিকদের ন্যায়বিচার পাবার ক্ষেত্রে যে সুযোগগুলো দেয় –

√ Innocent until proven guilty; অর্থাৎ, অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হবার আগ পর্যন্ত নির্দোষ।

√ Bail is the rule, imprisonment is exception; অর্থাৎ, জামিনই নিয়ম, বন্দী রাখাই ব্যতিক্রম।

√Accused must be convicted when he/she is proven guilty beyond shadow of doubt; অর্থাৎ, অভিযুক্তকে কেবল তখনই সাজা দেয়া যাবে, যখন আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে।

কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে জঙ্গী অভিহিত করে ডিবি, সিটিটিসি কর্তৃক মামলা দেয়ামাত্রই প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, সমকাল, জনকণ্ঠ, যুগান্তরসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া চরিত্র হননের সকল চেষ্টায় লিপ্ত হয়। এমনকি এসকল জঘন্য চরিত্রের সাংবাদিকরা এমন সব অতিরঞ্জিত কথাও বলে, যা পুলিশের স্ক্রিপ্টেও থাকে না! যাকে বলে, "More royal than the king!" তাই, জঙ্গী আখ্যায়িত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মিডিয়া ও বিচারবিভাগের গৃহীত মূলনীতি হলো- Guilty until proven innocent!

এছাড়া, যেহেতু সন্ত্রাস বিরোধী আইন জামিন অযোগ্য হিসেবে পাস করা হয়েছে, তাই "জঙ্গী" অভিহিতদের ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপিত মূলনীতি হলো- "বন্দী থাকাই কাম্য, জামিনই ব্যতিক্রম।"

আর সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করার প্রয়োজন তো পড়েই না, বরং পুলিশের সর্বনিম্ন স্তরের কোনো কনস্টেবলের সন্দেহই 'জঙ্গী' নামে আখ্যায়িত ব্যক্তির দন্ডপ্রাপ্ত হবার জন্য যথেষ্ট! আর মামলা আলোচিত হলে তো তাও লাগে না! স্রেফ দাবীই যথেষ্ট!

আসলে চাইলে এব্যাপারে অনেক কথাই বলা যায়। তবে, হাসিনার হিংস্রতার ব্যাপারে সাধারণ ধারণা রাখা ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন, তাদের জীবন ধ্বংস করলে জবাবদিহিতার কোনো শংকা নেই বরং প্রশংসিত হবার সুযোগই বেশী, তারা জঙ্গী নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার হতে পারে! বিশেষত এখনো যখন ডিবি অফিসের অন্তর্গত সিটিটিসি ভবনের নীচতলা ও সাততলার গুমঘরগুলো (যেখানে গুম হওয়া ব্যাক্তিদের পরিচয় হয় Non-entry হিসেবে) এখনো লোকচক্ষুর আড়ালে!

আর হাসিনার পতনের পরও সম্ভবত নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা এব্যাপারে মুখ খুলবে না। যেহেতু, অ্যামেরিকা সরাসরি এতে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। যে অ্যামেরিকা পুরো দুনিয়াতে আদর্শিক উপনিবেশ কায়েমের লালসায় মানবাধিকারের বাজারজাতকরণে নিমগ্ন, সে অ্যামেরিকাই মুসলিমদের ক্ষেত্রে হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তাই তো সিটিটিসি'র ভাষ্য হচ্ছে, "জঙ্গীবাদ আমাদের জন্য অত্যন্ত দরকারী ইস্যু। কেননা, এটি অ্যামেরিকার সাথে সরাসরি এনগেইজমেন্টের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র।"

তাই ইনসাফের দাবী আদায়ে, উচ্চ আদালত থেকে এই প্রহসনমূলক মামলা তিনটির (সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়ের করা দীপন, অভিজিৎ ও জুলহাস-তনয় হত্যা মামলা) পুনঃতদন্তের নির্দেশ থেকে আসা জরুরী।

এই হলো এমন এক ব্যক্তির আখ্যান যে কি না প্রায় এক যুগ আগে থেকেই কথা ও লেখার মাধ্যমে হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে তার সামর্থ্যানুযায়ী সক্রিয় হয়েছিল- নিজ আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রতি সৎ থাকার সংকল্পে। তাকে হাসিনার রাষ্ট্রযন্ত্র তার কুৎসিততম চেহারায় আবির্ভূত হয়ে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও অন্যায়ভাবে জুডিশিয়াল কিলিং এর উপযুক্ত করে তুলেছে।

নিশ্চয়ই আমি হাসিনার হিংস্রতার একমাত্র ও প্রথম ভিকটিম নই। তবে খুব সম্ভবত ঐ অতি অল্পসংখ্যক বৈষম্যের শিকার ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত, যার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করা স্বতন্ত্র আরেকটি অপরাধ।

পরিশেষে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পরিণতি পরিপক্কতা লাভের প্রাক্কালে কথা হলো-

ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল সর্বাধিক বৈষম্যের শিকার ব্যক্তিদের প্রতি হওয়া বৈষম্য অপসারণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে আগামীর নেতৃত্ব। নিশ্চয়ই তারা এক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নিবে। চারিত্রিক দৃঢ়তা, আত্মমর্যাদাবোধ, ন্যায়বিচার ও সাম্যের আলোকেই তারা সিদ্ধান্ত নেবে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী অ্যামেরিকা বা উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের অভিপ্রায় বা চাপ তাদের সামান্যতম প্রভাবিত করবে না, এ আশাই রাখি।

আর প্রকৃত কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা যা চান তা-ই হয়। নিশ্চয়ই সেদিন আর খুব বেশী দূরে নয়, যেদিন অত্যাচারীর নির্জন গোরে আশ্রিত হবে ফেরু!

সবশেষে বাংলাদেশের প্রত্যেক শ্রেণী-পেশার বিবেকবান মানুষ, বিশেষত ইসলামপন্থী, লিবারেল বা মার্ক্সিস্ট বুদ্ধিজীবি ও নের্তৃত্বের উদ্দেশ্যে র‍্যালফ চ্যাপলিনের ছোট একটি কবিতা উল্লেখ করে শেষ করছি-

Mourn not the dead that in the cool earth lie--
Dust unto dust--
The calm, sweet earth that mothers all who die
As all men must;

Mourn not your captive comrades who must dwell--
Too strong to strive--
Within each steel-bound coffin of a cell,
Buried alive;

But rather mourn the apathetic throng--
The cowed and the meek--
Who see the world's great anguish and its wrong
And dare not speak!